অগম মানুষ

সৈকত মুখোপাধ্যায়

উপগ্রহের উপুর চোখে গোলার্ধকে কেমন দেখতে লাগে? সবুজ ভেলভেটে মোড়া পিনকুশনের মতন?

তাই হবে। মোবাইল টাওয়ারের সারি বিদ্ধ করেছে তার হরিৎ পরিসরের প্রতিটি বিন্দু। সেই সব টাওয়ারের শীর্ষকে এক উঁচু থেকে অবিকল আলপিনের মাথার মতন -ই লাগে। আলপিনে বিদ্ধ, আলাপনে ঋদ্ধ সেই গোলার্ধকে পায়ের নীচে দেখতে পেয়ে পিনিক খেয়ে খুলে ওঠে স্যাটেলাইটের 'ডাইমন কাটা' বুক। আবারো সে কয়েক কোটি শব্দতরঙ্গকে এক ডানায় লুফে নিয়ে আরেক ডানায় ছুঁড়ে দেয় মোবাইল টাওয়ারগুলির দিকে। 'গেট কানেক্টেড, গেট কানেক্টেড' - সে চীৎকার করে ওঠে। 'ওগো পার্থি মানবমানবী, একা হয়োনা। সারাক্ষণ এ একে ছুঁয়ে থাকো, এ ওর সাথে কথা চালিয়ে যাও। কমিউনিকেট, কমিউনিকেট।

'মিনিকিট খেয়ে কমিউনিকেট করো।

'কমিউনিস্ট হলেও কমিউনিকেট করো।

'অনিকেত হলেও কমিউনিকেট করো।

'কম নৈকট্যে কমিউনিকেট করো।

'বিশ্বাস রাখে বিশ্বায়নের এই আপ্তবাক্যে, —আলাপী লোকের গোলাপী জীবন। ঘরের কোণা থেকে সরিয়ে ফেলো আত্মমগ্ন বুদ্ধের মূর্তি। সেই জডায়গায় স্থাপন কর লাফিং বুদ্ধের পুতুল। আতাক্যালানো যুগাবতার। শিশ্নোদর পরায়ণ নির্বোধ ঈশ্বর।'

হঠাৎই স্যাটেলাইটের টাইট টাইটানিয়াম কপালে ভাঁজ পড়ে। কয়েকটি আহ্বান বিফল হল।

কেন, কেন, কেন? কয়েকটি মেসেজ একটি উদ্দিষ্ট সেলফোনকে খুঁজে না পেয়ে, হাঙরের উদরসংলগ্ন পাইলট ফিশের মতন তার পেটে ঝুলে রইল। কেন, কেন, কেন?

স্যাটেলাইট তার কামেনরা চোখ জুম করে আতিপাতি খুঁজতে লাগল বিফল কল-এর কারণ। কোথায় গেলি রে, নয় আট শূন্য তিন...কোথায় তুই? নাঃ, পাওয়া গেল না। বিমর্ষ মুখে উপগ্রহরাজ যোগাযোগকারীদের সেলফোনে জবাবি বার্তা পাঠাল, 'নম্বরটি আপাতত যোগাযোগসীমার বাইরে।' তারপর আবার ক্যামেরাচোখে তল্লাসি চালাল। আরেঃ, ওইখানটায় একটু ফাঁকা ফাঁক লাগছে না?

উড়িষ্যা,...হুঁ হু...পাহাড়...হ্যাঁ হ্যাঁ...জঙ্গল...নদী...মহানদী। ওখানে কেন টাওয়ার নেই? আরে একি! টাওয়ার না থাকলে সব পাওয়ার গাঁওয়ার লোকেদের হাতে চলে যাবে না? শেষকালে ডেনকালির জঙ্গলের ডঙ্কা - বাজানো বাবাকালীদের হাতেই ফিরিয়ে দিতে চাস নাকি টেলি - যোগাযোগ ব্যবস্থা? আরে এই ভোঁদা, এই বিশে, এই ট্যাটন! তোরা সাভিস - প্রোভাইডাররা কী করছিস রে? তোর শিল্পিরি ওখানে একটা টাওয়ার পুঁতে দিয়ে আয় না। ণহানদী...সাতকোশীয়া গর্জ। কটক থেকে বেশী দূরে তো নয়।

'অল ইউ হু স্লিপ টু নাইট। মাত্র ছ'মাস আগে বিক্রম শেঠের এই কবিতার বই পড়ছিল যে মেয়েটা, সে কাল রাতে মারা গেছে। শাশ্বত এখন তাকে অন্য একটি কবিতা শোনাতে চায়। শাশ্বত চায় নির্জনতা, যে নির্জনতায় কাবেরী এখনো তার পাশে এসে বসতে পারে।

কাল রাত বারোটায় কনাইভেন্স - ইন্ডিরায় ভুবনেশ্বর ব্রাঞ্চের আটতলা অফিসবাড়ির গেটে এসে দাঁড়ায় কাবেরী। অবিবাহিতা কাবেরী তার মা বাবার সাথে ভুবনেশ্বরের উপকণ্ঠে নতুন গড়ে ওঠা সাগর বিহার হাউসিং কমপ্লেক্স থাকত। কাল রাত বারোটায়, ঘটনাচক্রে, তার বাসস্থানের ওদিকে যাবার মতন দ্বিতীয় কোনো লোক ছিল না। কাবেরী একাই সিকিউরিটি -ডেস্কে এসে গাড়ির খোঁজ করে ছাউরঙের ইউনিফর্ম - পরা যে মানুষগুলো ইদানিং সিকিউরিটির নামে যে কোনো মেট্রোপলিসের মানবিক মুখে ওপর গুয়ে মাছির মতন ঘোরাঘুরি করে, সেরকম -ই কটা মূলত অশিক্ষিত এবং নির্বোধ লোক, কাবেরীর বাড়ি ফেরার জন্য কানইভেন্স - ইন্ডিয়ান কারপুল থেকে একটা গাড়িকে ডেকে, কাবেরীকে সেই গাড়িতে রওনা করিয়ে দেয়। এই কাজ করতে গিয়ে তারা যে যে সুরক্ষাবিধি ভঙ্গ করে, সেগুলি হল—

আই টি সেক্টরের কোনো মহিলা কর্মীকেই বেশী রাত্রে একা কোনো গাড়িতে যেতে দেওয়া হবে না। এমনকি, কয়েজন পুরুষ সহযাত্রী তথা সহকর্মী থাকলেও, তারা যদি আগে নেমে যান, অর্থাৎ গন্তব্যের শেষ যাত্রী যদি সেই মহিলাই হন, তাহলে আই টি ফার্মের একজন সিকিউরিটি গার্ড সেই গাড়িতে উঠে পড়বে, এবং মহিলা যাত্রীটিকে নিরাপতে নামিয়ে দিয়ে সে ফিরে আসবে। কোনো অবস্থাতেই গাড়িভাড়া দেয় যে এজেন্সি, তার কাছ থেকে ছাড়া, বদলির কোনো ড্রাইভার নিয়োগ করা যাবে না, এবং বদলির ড্রাইভার হলেও, তার নাম ধাম পরিচয় সবই যাচাই করে নেবে আই টি ফার্ম।

কাবেরীকে কাল রাতে যে গাড়িতে তুলে নেওয়া হয়েছিল, সেই গাড়ির ড্রাইভার ছিল নতুন। রাত বারোটার পর কাবেরী সেই গাড়িতে যাত্রা শুরু করেছিল। ভুল করেছিল অবশ্যই; কিন্তু দুনিয়াদারি কাবেরী কোনোদিনই ভালো বুঝত না। সে ছিল এক আকাশচারী, আচাভুয়া মেয়ে।

যেমন শাশ্বতর সঙ্গে প্রথম যেদিন তার আলাপ হয় সেদিন সে 'আল উই হু' ...বাইটা ক্যান্টিনের চেয়ারে নামিয়ে রেখে নিজের কিউবিকলে ফিরে গিয়েছিল। উল্টোদিকের চেয়ারে বসে থোসা খেতে খেতে শাশ্বত সেটা খেয়াল করে এবং কাবেরীকে বইটা ফেরত দিয়ে আসে। আই টি সেক্টরের যান্ত্রিক, একরঙা পরিবেশের মধ্যে বসে যে মেয়ে প্রেমের কবিতা পড়তে পারে

তাকে বালো না বেসে পারে না শাশ্বত। অপরপক্ষে, কাবেরীও খেয়াল করে শাশ্বতর মধ্যে কারিগরি বিদ্যের অধিক কিছু শিক্ষার দীপ্তি, এবং শিকড়ের অভিমান, ফলে, কাবেরী পানিগ্রাহি আর শাশ্বত বসু খুব শিগ্গিরি এ ওর বন্ধু হয়ে গিয়েছিল। নিরন্তর অনবসরের মধ্যে, একে অন্যের মুখোমুখি হলেই মন বলে উঠতো— আঃ, মস্ত ছুটি। ওরা জানত না সেই ছুটির মেয়াদ ছিল মাত্র ছ'মাস।

গত রাত্রে, কোটি কোটি যৌন উপবাসী ভ্রাম্যমান ভারতীয় পুরুষের মধ্যে একজন, গাড়ি ঘুরিয়ে নেয় মেরিনড্রাইভের দিকে ঃ পথে তুলে নেয় আরো তিনজন ক্ষুৎকাতর বন্ধুকে, এবং কাবেরীর শরীর দিয়ে তারা উপবাস ভাঙে।

রাত তার অনেক আগে পেরিয়ে গিয়েছিল মধ্যরাতের রেখা। সাশ্বতর সেদিন মর্নিংশিফট - এ ডিউটি ছিল। তার দিনের শেষে সে মেসের বিছানায় অকাতরে ঘুমোচ্ছিল, সকালে ঘুম থেকে ওঠার পরে যুগপৎ দুটি জিনিস তার চোখে পড়ে। এক, টি-ভির ব্রেকিং নিউজে কাবেরীর মৃত মুখ, এই দুটি, তার মোবাইল স্ক্রিনে কয়েকটি ব্যর্থ আহ্বানের অভিজ্ঞান। সবকটি ডাকই এসেছিল কাবেরীর কাছ থেকেই, হয়তো তার মৃত্যুর আধঘন্টা আগে। হয়তো সহসা তার নিয়তি বুঝতে পেরেছিল কাবেরী; বুঝতে পেরে সবার অলক্ষ্যে ব্যাগের মধ্যে হাত চালিয়ে চেপে ধরেছিল সেলফোনের কুইক ডায়েলের সেই বোতামটি, সেকানে স্মৃতিধৃত ছিল শাশ্বতর নাম। তারপর কারেরীর হয়ে যে কতক্ষণ শাশ্বতর সেলফোন আছাড়িপিছাড়ি কেঁদেছে তা শাশ্বত জানে না। সকালে উঠে সে শুধু দেখেছে বালির ওপরে পলায়নপিয়াসী একটি মেয়ের পায়ের ছাপের মতন একটি...দুটি...তিনটি...চারটি মিসড-কল এর দাগ পড়ে আছে।

শাশ্বত সঙ্গে সঙ্গেই তার সেলফোনের সিমকার্ড খুলে ফেলে, কারণ তার মনে পড়ে যে ওই শেষ কটি হিমায়িত আহ্বান ছাড়া তার কাছে কাবেরীর কোনো স্মৃতিচিহ্ন নেই। ওই চিহ্নগুলি নিয়ে সে পালাবে ঠিক করল; পালাবে এমন জায়গায় যেখানে আর কোনো কল আসবে না। আর কোনো নতুন পায়ের ছাপ এসে মুছে দেবেনা কাবেরীর গতায়ু পদচিহ্নগুলি।

অবশ্য তার আগে শাশ্বত কাবেরীর বাড়িতে যায়। তার বাবাকে সঙ্গে নিয়ে হাসপাতল, মর্গ, থানা, এবং শ্মশানে সমস্ত কৃত্য শান্ত ভাবে সম্মন্ন করে এবং সবশেষে যাই কনাইভেন্স ইন্ডিয়ার অফিসে, একা। সেই অফিসের হিম শৈত্য দেখে শাশ্বতার মাথায় রক্ত চয়ে যায়। যে বাড়ির মসৃণ কাচে মোড়া দেয়ালে কাল রাতে বারোটা অবধি কাবেরীর ছায়া পড়েছে, যে বাড়ির শত কিউবিকলের মধ্যে একটায় এখনো কাবেরীর শিশু বোনঝির হাসিমুখের ছবি বোর্ডপিন দিয়ে গাঁথা আছে, যে বাড়ি তেকে এক অর্থে তার শবযাত্রা শুরু হয়েছিল— সেই বাড়ির অধিকর্তারা কাবেরীর মৃত্যুতে নিজেদের দায় যখন পুরোপুরি অস্বীকার করলো তখন শাশ্বত লাধি মেরে অধিকর্তার ঘরের স্যুইং ডোর ভেঙে দিয়ে বেরিয়ে আসে। আশেপাশের পৃথিবী খুব তাড়াতাড়ি কাবেরীকে ভুলে যেতে চাইছে এ কথা বুঝতে পেরেই শাশ্বত আরো চাইছিল তার স্মরণ। মহানদীর তীরে। টিকরপাড়ার গহন বনভূমির প্রান্তসীমা ধরে হাঁটতে হাঁটতে শাশ্বত তার সেলফোন থেকে খুলে রাখা সিমকার্ডটা আবার ভয়ে নিল। এক চব্বি— বছরের তরুণীর আতঙ্কে নীল হৃদপিণ্ডের মতন জ্বলে উঠল স্ক্রিন। এখানে টাওয়ার নেই। আঃ, আর কোনো কল এসে সরাতে পারবে না এই শে, লেখাটাকে— 'মিসড্ কল।' ব্যর্থ আহ্বান। সেলফোনটা কানের কাছে নিয়ে শাশ্বত খুব স্বাভাবিক স্বরে বলল, 'তুমি আমায় ডেকেছিলে কাবেরী? আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। শোনো, তুমি তো বাংলা কবিতা শুনতে ভালোবাস। একটা অবিতাই আজ সকাল থেকে মাথায় ঘুরছে, তোমাকে শোনাইঃ—

তোমার দুঃখের ভেরী বনান্তরালে বাঁধা ছিল।
এখন যে বেজে উঠছে তার জন্যে দুঃখ করো না।
এরকমই কথা ছিল। এরকমই ঘটে এ জীবনে।
শুধু কান পেতে শানো, শুধু বোসো, শুধু অন্ধকার
আরো একটু গাঢ় হলে লন্ঠন জ্বালিয়ে জেগে থাকো।

সাতকোশিয়া গর্জের গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে জাগ্রত সেই মৃদু নীল আলো চোখ এড়ালো না উপগ্রহের। ওই এক অগম মানুষ, ওই এক অগম মানবী, এখন কথা বলছে। এই পরিস্থিতিতে তার ভূমিকা কী হবে, তাই ভাবতে ভাবতে উপগ্রহটি আরো কিছুটা জীর্ণ হল।

কবিতা ঋণ: প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত